ও রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব তওহীদ ও রিসালত প্রমাণিত হওয়ার পর এখনও কি তোমরা মুসলমান হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ রসূলে করীম (সা)-এর রিসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাব-জাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং উহা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রকৃতির ও জলদি-প্রিয়। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোন নিয়ামতের স্বাদ-আস্বাদন করাবার পর যদি উহা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা হতাশ ও না-শোকর বনে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি উহা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবত জলদি-বাজ, বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই, সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নিয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামি করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুঃখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহঙ্কার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমার যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এ কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে چنانی نماند چنین نیز هم نخواهد ماند তা যেমন রয়নি এও তেমনি থাকবে না, থাকাটাই বরং অসম্ভব।

অতীত ও ভবিষ্যতকে ভুলে গিয়ে বর্তমান-পূজায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাধি মানুষের মন-মগজকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, একজন ক্ষমতাসীনের রক্তমাখানো মাটির উপর আরেকজন স্বীয় মসনদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং কখনো পেছনে ফিরে তাকাবার সুযোগ হয় না যে, তার পূর্বসূরী একজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিও ছিল, তার পরিণতি কত মর্মান্তিক হয়েছে। বরং ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করার নেশায় বুঁদ হয়ে এর শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকে।

এহেন বর্তমান-পূজার ব্যাধি ও ভোগমত্ততার রোগ হতে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, নবী-রসূল (আ)-গণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা অতীত ইতিহাসের শিক্ষামূলক ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ সাফ-ল্যের চিন্তা সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তাঁরা উদাত্তকণ্ঠে আহবান জানিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের পরিবর্তনশীল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখ, এক পরাক্রমশালী মহাশক্তি অন্তরাল হতে একে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। তোমরাও তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চল। হযরত শায়খুল-হিন্দের ভাষায় বলতে হয় ঃ

انقلابات جہاں واعظ رب ہے دیکھو - ہر تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم

'জগতের পরিবর্তনসমূহ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে উপদেশ দিচ্ছেন, প্রতিটি পট-পরিবর্তন ডাক দিয়ে যায়—উপলব্ধি কর, অনুধাবন কর।' পূর্ণ ঈমানদার তথা সত্যিকার মানুষ ঐ সব ব্যক্তি যারা সাময়িক সুখ-দুঃখ ও বস্তুজগতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন না। বরং সকল সুখ-দুঃখ, প্রতিটি আবর্তন-বিবর্তন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল এক মহাশক্তিকে অনুধাবন করেন। কার্যকারণের পেছনে না ছুটে বরং উহার মূল উৎস ও স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই প্রকৃত বুদ্ধি-মানের কাজ।

১১ নং আয়াতে এমনি ইনসানে-কামিল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য ইরশাদ করেছেন ঃ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا— وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি—সৎকর্ম-শীলতা।

صبر—সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বন্ধন করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যায় কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে 'সবর' বলে। সুতরাং শরীয়তের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কিয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কার্যে মশগুল থাকে তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে—

أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গোনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের সৎকার্যসমূহের বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ্ তা'আলা أَذَقْنَا "স্বাদ আস্বাদন করাই"---বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বরং মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনা স্বরূপ যৎকঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেয়া হয়েছে, যেন আখিরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং পার্থিব সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন বোকামি, তদ্রূপ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশায়ও অত্যধিক বিমর্ষ হওয়া উচিত নয়। বস্তুত দুনিয়াটাকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখিরাতের একটা প্রদর্শনীস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেখানে আখিরাতের সুখ-দুঃখের নমুনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২ নং আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সা) সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করেছিল। প্রথমত তারা বলল, 'এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি হয়ত অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন।' ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ "আপনি অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।"---(তফসীরে-বগবী ও তফসীরে মাযহারী)

দ্বিতীয়ত তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুয়তের প্রতি ঐ সময় বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌দের মত আপনার আয়ত্তে কোন ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে আপনি সবাইকে দান করছেন। অথবা আসমান হতে কোন ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবে এবং আপনার কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসূল।"

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রসূলে করীম (সা) মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ, তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তাঁর ইখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরী ও শিরকের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হিদায়তের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, রাহমাতুল-লিল্ 'আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়, নবুয়তকে তারা বাদশাহীর উপর কিয়াস

করে বসেছিল। আসলে ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলারও এমন কোন দস্তুর নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। নতুবা নিখিল সৃষ্টি-জগত তাঁর অপার কুদরতের করায়ত্ত। কার সাধ্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হিকমতের তাগিদে ইহ-জগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকার্য সম্পাদন অথবা অন্যায়-অসত্য হতে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে মজবুর বা বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাযিল করে ভাল-মন্দের পার্থক্য এবং উহার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সৎকার্য করা ও অসৎকার্য হতে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মু'জিযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত। ফলে এ দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হত। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান-বিল গায়েব বা গায়েবের প্রতি ঈমান হত না। অথচ ঈমান বিল-গায়েবই হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার ইখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই ইখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অতএব, তাদের আবদার ছিল নিরর্থক ও অবাঞ্ছিত। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে তাদের এহেন বেহুদা আবদার প্রমাণ করে তারা নবী ও রসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহিল ছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহ্র ন্যায় রসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রসূলের কাছে তারা এমন আবদার করছে—যা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যা হোক, রসূলে করীম (সা) তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করা ও মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হল। যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহ্র প্রেরিত কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন? যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরিকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করছে। এখানে لعلك শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরিকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রসূলে পাক (সা) কোরআন করীমের কোন আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ, তিনি তো আল্লাহ্র পক্ষ হতে نذير ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই নবীর মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফির ও মুশরিকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে نذير নাযীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نذير (ভীতি প্রদর্শক) ছিলেন, অপরদিকে সৎকর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بشير সু-সংবাদদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর'-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হযরত (সা)-এর মু'জিযা পাক-কোরআন তোমাদের সম্মুখে বর্তমান রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ মু'জিযার দাবি করে থাক, তাহলে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবি পূরণ করা হয়েছে! সুতরাং নতুন কোন মু'জিযা দাবি করার তোমাদের কোন অধিকার নেই। আর যদি ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জিযার দাবি করে থাক তাহলে তোমাদের মত হঠকারী লোকেরা মু'জিযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশা করা যায় না। সারকথা, কোরআন করীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জিযা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফির ও মুশরিকরা যেসব অমূলক সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কোরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম নয়; বরং হযরত (সা) স্বয়ং তা রচনা করেছেন! যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে-উম্মী (সা) নিজে রচনা করেছেন তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তির দশটি সূরা তৈরি করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জ্বিন, তথা দেবদেবী সবাই মিলে তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরি করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কোরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হত। সকলের অপারক হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কোরআন আল্লাহ্ পাকের ইল্‌ম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারক হল, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কোরআন করীমের সূরা বাকারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ তোমরা পবিত্র কোরআনকে যদি মানুষের তৈরি কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশি নয়, অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে আন। কিন্তু তাদের জন্য অতদূর সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও কোরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে সক্ষম হল না। অতএব, কোরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম

ও স্থায়ী মু'জিযা হওয়া সন্দেহাতীত প্রমাণিত হল। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে— فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ অর্থাৎ এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبٰطِلٌ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ
وَمِنْ قَبْلِهِ كِتٰبُ مُوسٰى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

(১৫) যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। (১৬) এরাই হল সেসব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (১৭) আচ্ছা বল তো—যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র তরফ হতে একটি সাক্ষীও বর্তমান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মূসা (আ)-র কিতাবও সাক্ষী যা ছিল পথ নির্দেশক ও রহমত-স্বরূপ, (তিনি কি অন্যান্যের সমান?) অতএব তারা কোরআনের প্রতি ঈমান আনে। আর ঐসব দলের যে কেউ তা অস্বীকার করে, দোযখই হবে তার ঠিকানা। অতএব, আপনি তাতে কোন সন্দেহে থাকবেন না। নিঃসন্দেহে এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ধ্রুব সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি (স্বীয় পুণ্যকার্যের বিনিময়ে শুধু সুখ-শান্তিময়) পার্থিব জীবন কামনা করে এবং তার চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, (অর্থাৎ আখিরাতের সওয়াব ও প্রতিদান কামনা করে না; বরং শুধু পার্থিব জীবনে সুনাম ও প্রসিদ্ধি এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি

কাম্য হয়,) তাহলে আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের নেক কার্যসমূহের প্রতিফল পুরো-পুরি ভোগ করতে সুযোগ দেই এতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। (অর্থাৎ তাদের পাপকার্যের তুলনায় পুণ্যকার্য বেশি হলে তার প্রতিদান স্বরূপ ইহ-জীবনেই তাদের সু-স্বাস্থ্য, সুখ্যাতি, সম্মান-প্রতিপত্তি, আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও অধিক সন্তানসন্ততি দান করা হয়। পক্ষান্তরে পুণ্যের চেয়ে পাপের পরিমাণ বেশি হলে তার কর্মফলও ভিন্নতর হয়ে থাকে। এ হচ্ছে পার্থিব কর্মফল।) কিন্তু তারা এমন লোক যে, আখিরাতে তাদের জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছু (প্রতিদান) নেই। আর তারা যা কিছু করেছিল আখিরাতে সবই বরবাদ সাব্যস্ত হবে এবং যা কিছু তারা উপার্জন করছে, (নিয়ত দুরস্ত না হওয়ার কারণে এখনও তা) সবই নিস্ফল হচ্ছে। (বর্তমানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে মূল্যবান ও সার্থক মনে করা হলেও পরকালে এ বাহ্যিক সার্থকতাও বিলুপ্ত হবে।) কিন্তু কোরআন অস্বীকারকারী এমন ব্যক্তির সমান (হতে পারে) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত স্পষ্ট দলীলের উপর অবিচল রয়েছে? আর (তার) একজন সাক্ষী তো তার সাথেই রয়েছে, (অর্থাৎ কোরআন পাকের মু'জিযা হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।) আর এক সাক্ষী তার পূর্ববর্তী হযরত মূসা (আ)-র কিতাব (অর্থাৎ তওরাতও এর সত্যতার সাক্ষ্যদানের জন্য প্রেরিত হয়েছে) যা ছিল (আহকাম শিক্ষাদানের দিক দিয়ে পথনির্দেশক) ইমাম (স্বরূপ) এবং (আমলের প্রতিদান ও সওয়াবের দিক দিয়ে) রহমতস্বরূপ; (সারকথা, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।) অতএব, (ইতিপূর্বে যাদেরকে স্পষ্ট দলীলের ধারক বলা হয়েছে) তাঁরা উক্ত কোরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর ঐসব (কাফিরদের) দলগুলির যেসব লোক কোরআনকে অস্বীকার ও অমান্য করে দোযখই হচ্ছে তাদের ওয়াদাস্থল। (এমতাবস্থায় কোরআন অমান্যকারীরা কোরআন বিশ্বাসীদের সমকক্ষ কিরূপে হবে?) অতএব, (হে শ্রোতা) কোরআনের (সত্যতার) ব্যাপারে কোন সন্দেহে পতিত হইও না। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে (আগত) মহাসত্য গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু (অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, এত অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ সত্ত্বেও) অনেকেই তা বিশ্বাস করে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলীকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সৎকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন? আজকাল পাণ্ডিত্যের দাবিদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ইত্যাদি কোন জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এ আয়াতে (১৫ নং) সে মনোভাবেরই জবাব দেয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রসূলে আকরাম (সা)-এর তরীকা মুতাবিক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ, গুণ-গরিমা, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখিরাতে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যত তা যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং এর দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না; বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল—যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোক তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি—আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখিরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের প্রাণহীন সৎকার্য আখিরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নিয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার যোগ্য ছিল না। কাজেই আখিরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শিরকী ও গোনাহ্র কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এটাই ১৫ নং আয়াতের সংক্ষিপ্তসার। এবার অত্র আয়াতের শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করুন।

ইরশাদ হয়েছে, যারা শুধু দুনিয়ার যিন্দেগী ও এর চাকচিক্য কামনা করে, তাদের যাবতীয় সৎকার্যের পূর্ণ প্রতিদান আমি এখানেই দান করি, আর এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনরূপ কমতি করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য দোযখের আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, অত্র আয়াতে কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুসারে مَنْ اَرَادَ সংক্ষিপ্ত শব্দের পরিবর্তে দীর্ঘতর مَنْ كَانَ يُرِيْدُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বাকরীতিতে চলমান কাল বোঝায় এবং এর অর্থ হচ্ছে—যারা পার্থিব জীবন কামনা করতে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অত্র আয়াতে শুধু ঐ সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা নিজেদের সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব ফায়দাই হাসিল করতে চায়। আখিরাতে মুক্তিলাভের কল্পনা তাদের মনের কোণে কখনো উদয় হয় না। পক্ষান্তরে যারা আখিরাতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে এবং সাথে সাথে পার্থিব কিছু লাভের আশাও রাখে, তারা অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অত্র আয়াত কি কাফিরদের সম্পর্কে, না মুসলমানদের সম্পর্কে অথবা কাফির ও মুসলমান উভয়ের সম্পর্কে, এ ব্যাপারে তফসীরকার ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, 'আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতে করে বোঝা যায় যে, অত্র আয়াত কাফিরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহর

শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে দোযখ হতে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহ্হাক প্রমুখ মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফিরদের উপর প্রযোজ্য।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐ মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, যশ-মান, খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোযখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐ সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফির হোক অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখে না, বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রা), মায়মুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (র) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রসূলে করীম (সা)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস انما الاعمال بالنيات দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটিও তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখিরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে আখিরাতের নিয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্বধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি। (তফসীরে কুরতবী)

হাদীস শরীফে আছে কিয়ামতের দিন ঐসব লোককে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করা হবে, যারা লোকসমাজে সুনাম ও প্রশংসা লাভের জন্য লোকদেখানো মনোভাব নিয়ে ইবাদত ও সৎকার্য করেছে। তাদেরকে বলা হবে যে, "তোমরা দুনিয়াতে নামায পড়েছ, দান-খয়রাত করেছ, জিহাদ করেছ, কোরআন তিলাওয়াত করেছ; কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেন লোকে তোমাদেরকে মুসল্লী, দাতা, বীর ও কারী সাহেব বলে। তোমাদের যা কাম্য ছিল, তা তোমরা পেয়েছ, দুনিয়াতেই তোমরা এসব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছ। অতএব, আজ এখানে তোমাদের কার্যাবলীর কোন প্রতিদান নেই।" অতপর তাদেরকেই সর্বপ্রথম দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কোরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখিরাতে লাভ করবে। আর কাফিররা যেহেতু আখিরাতের কোন ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলীর প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখিরাতে উপস্থিত হবে তখন সেখানে পাওয়ার মত তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না।

তফসীরে মাযহারীতে আছে যে, মুমিন ব্যক্তি যদিও পার্থিব সাফল্য ও প্রত্যাশা করে, কিন্তু আখিরাতের আকাঙ্ক্ষাই তার প্রবলতর থাকে। সুতরাং দুনিয়ায় সে প্রয়োজন পরিমাণ পায় এবং আখিরাতে বিপুল প্রতিদান লাভ করে।

হযরত উমর ফারূক (রা) একদা হুযুর (সা)-এর গৃহে হাযির হলেন। সারা ঘরে হাতেগোনা কিছু আসবাবপত্র ছাড়া বেশি কিছু জিনিসপত্র দেখতে পেলেন না। তিনি আরজ করলেন—"ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আপনার উম্মতকে দুনিয়ায় সচ্ছলতা দান করেন। আমরা পারসিক ও রোমকদেরকে দেখেছি, তারা দুনিয়ায় অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতই করে না।" রসূলুল্লাহ্ (সা) এতক্ষণ তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন—হে উমর! তুমি এখন পর্যন্ত এহেন চিন্তাধারা পোষণ করছ! এরা তো ঐসব লোক যাদের কাজের প্রতিফল ইহজীবনেই দান করা হয়েছে।

জামে তিরমিযী ও মসনদে আহমদে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ ফরমান—যে ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে আখিরাত লাভ করতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও বেনিয়াজ করে দেন এবং তার পার্থিব প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে দেন, দুনিয়া তার কাছে নত হয়ে ধর্ণা দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিল করতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুহতাজ ও পরমুখাপেক্ষী করে দেন। তার অভাব ও দৈন্য কখনো দূর হয় না। কারণ, দুনিয়ার মোহ তাকে কখনো নিশ্চিন্তে বসার অবসর দেয় না। একটি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আগেই আরেকটি প্রয়োজন তার সামনে উপস্থিত হয়। আর অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী তাকে পেয়ে বসে। অথচ শুধু ততটুকুই সে প্রাপ্ত হয়, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তাদেরকে দুনিয়াতেই পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হয়, কোন কমতি করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা শুধুমাত্র পার্থিব সুখ-সম্পদ হাসিল করতে চায় এবং এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা-তদবীরও করে, কিন্তু তা

সত্ত্বেও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কিছুই পায় না। এর কারণ কি?

জবাব এই যে, কোরআনুল করীমের অত্র আয়াতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর তফসীর সূরা বনি ইসরাঈলের এই আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ -

অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুইটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে—আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মুতাবিক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—আমার হিকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭ নং আয়াতে নবী করীম (সা) এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মুকাবিলায় তুলে ধরা হয়েছে—যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুইটি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতপর রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশ্বমানবের জন্য রসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভাল কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামী হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যিনি কোরআনের ধারক ও বাহক এবং তার উপর স্থির-অবিচল, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সত্যতার একটি প্রমাণ তো এর মধ্যেই মৌজুদ রয়েছে এবং এর পূর্বে মূসা (আ)-র কিতাবও এর সাক্ষী—যা ছিল মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য এবং রহমতস্বরূপ।

অত্র আয়াতে بَيِّنَةٌ বলে কোরআন পাককে বোঝানো হয়েছে। شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল-কোরআনে হযরত থানবী (র) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহিদ' অর্থ পবিত্র কোরআনের اَعْجَاز ইজায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কোরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কোরআনের উপর কায়েম রয়েছে, আর কোরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো খোদ কোরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

কেননা, কোরআন যে আল্লাহ্ তা'আলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

দ্বিতীয় বাক্যে হুযূর (সা) ও কোরআনের প্রতি ঈমান ও একীনকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব-মানবের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে-কোন ব্যক্তি আপনাকে অমান্য বা অস্বীকার করবে জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—আমার প্রাণ যার কুদরতের করায়ত্ত, সেই মহান সত্তার কসম; যে-কোন ইহুদী বা খৃস্টান আমার দাওয়াত শোনা সত্ত্বেও আমার আনীত শিক্ষার উপর ঈমান আনবে না, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ঐসব লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হওয়া উচিত, যারা ইহুদী, খৃস্টান বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের প্রশংসনীয় কার্যাবলী দেখে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর কায়েম বলে সাফাই পেশ করে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এবং কোরআন পাক ও রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতিরেকে শুধু বাহ্যিক সৎকার্যাবলীকেই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে। এহেন ধ্যান-ধারণা পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতে করীমা ও সহীহ্ হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۭ أُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى
رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ
أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ ﴿١٨﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْأٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٩﴾ أُولٰٓئِكَ لَمْ
يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مِنْ أَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۭ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ هُمُ
الْأَخْسَرُوْنَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوْٓا إِلٰى

رَبِّهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ
كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

(১৮) আর তাদের চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐ সব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল ; শুনে রাখ, জালিমদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত রয়েছে। (১৯) যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আখিরাতকে অস্বীকার করে। (২০) তারা পৃথিবীতেও আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই ; তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে ; তারা শুনতে পারত না এবং দেখতেও পেত না। (২১) এরা সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর তারা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে (২২) আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, কোন সন্দেহ নেই। (২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনয় প্রকাশ করেছে, তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) উভয় পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তাদের চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে (অর্থাৎ তাঁর একত্ববাদ, তদীয় রসূলের রিসালত ও তাঁর কালামকে অস্বীকার করে। কিয়ামতের দিন) এসব লোককে (মিথ্যাবাদী, অপরাধীরূপে) তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্মুখীন করা হবে। আর (তাদের কার্যকলাপের) সাক্ষী (ফেরেশতাগণ (প্রকাশ্যভাবে সামনা-সামনি) বলতে থাকবে (যে,) এরাই ঐসব লোক যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (সবাই) শুনে রাখ, (ঐসব) জালিমদের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত রয়েছে. যারা (নিজেদের কুফরী ও জুলুমের সাথে সাথে অন্যদেরকেও) আল্লাহ্‌র পথে (দীন-ইসলাম হতে) বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায় ; (দীনের পথে সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়, যেমন অন্য লোকদের পথভ্রষ্ট করতে পারে) এরাই আখিরাতকে অস্বীকার করে। (এ পর্যন্ত সাক্ষী ফেরেশতাগণের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, সামনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) তারা (পার্থিব জীবনে সমগ্র) পৃথিবীতে (কোথাও আত্মগোপন করে) আল্লাহকে অপারক করতে (অর্থাৎ তাঁর নাগালের বাইরে চলে যেতে) পারবে না এবং (আজকে একমাত্র) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের

আর কোন সাহায্যকারীও নেই (যে আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে তাদের উদ্ধার করবে। এখন অন্যদের তুলনায়) তাদের দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে; (এক—তাদের কাফির থাকার অপরাধে, দ্বিতীয়—অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে বাধাদানের অপরাধে।) তারা (চরম বিদ্বেষের কারণে আল্লাহ্ ও রসূলের অমূল্য বাণী) শুনতে পারত না এবং (ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে সত্য-সঠিক, সরল পথ) দেখতে পেত না। এরা সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর তারা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল তা সবই (আজ) তাদের থেকে গায়েব (এবং নিরুদ্দেশ) হয়ে গেছে। (কেউই তো কোন কাজে লাগেনি, অতএব) এটা অনিবার্য যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (এতক্ষণ কাফিরদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে, সামনে ঈমানদারদের পরিণাম বর্ণিত হচ্ছে) —নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আর ভাল ভাল কাজ করেছে এবং একাগ্রচিত্তে স্বীয় পালনকর্তার দিকে ঝুঁকেছে (অর্থাৎ অন্তরে আনুগত্য ও বিনয়ভাব সৃষ্টি করেছে) তারাই বেহেশতবাসী (হবে) এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (এতদ্বারা মু'মিন ও কাফির উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান সূচিত হল। সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে উভয়ের অবস্থার পার্থক্য তুলে ধরা হচ্ছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরিণতিও ভিন্নতর হবে। ইরশাদ হচ্ছে, উভয় পক্ষের অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত (মু'মিন ও কাফিরদের) দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন (এক ব্যক্তি) অন্ধ ও বধির (ফলে কথা বলেও তাকে বোঝানো যায় না এবং ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারাও কিছু বোঝানো সম্ভব হয় না।) আর (অপর এক ব্যক্তি) যে দেখতেও পায়, শুনতেও পায় (তাই অনায়াসে তাকে বোঝানো সম্ভবপর। অবস্থার দিক দিয়ে) তারা উভয়ে কি এক সমান? (নিশ্চয়ই নয়। কাফির ও মু'মিনের অবস্থাও অনুরূপ। একজনের হিদায়ত সুদূর পরাহত, অন্যজন হিদায়তপ্রাপ্ত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে সন্দেহের কান অবকাশ নেই।) তোমরা কি বুঝতে পারছ না?

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ز اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّا
تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ فَقَالَ
الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا
نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ج وَمَا نَرٰى
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ

لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝
وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝
وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ
اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ
خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ
كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاۗءَ وَمَآ
اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ
اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ۭ هُوَ رَبُّكُمْ ۣ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ اَمْ
يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْۗءٌ مِّمَّا
تُجْرِمُوْنَ ۝

(২৫) আর অবশ্যই আমি নূহ (আ)-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, (তিনি বললেন---) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৬) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। (২৭) তখন তাঁর কওমের কাফির প্রধানরা বলল--- আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না; এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। (২৮) নূহ্ (আ) বললেন---হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন,

তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি তা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি? (২৯) আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র যিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। (৩০) আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ্‌ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? (৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়েবী খবরও জানি; একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা; আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ্‌ তাদেরে কোন কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্‌ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব। (৩২) তারা বলল—হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন। (৩৩) তিনি বলেন, তা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌ই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। তখন তোমরা পালিয়ে তাঁকে অপারক করতে পারবে না। (৩৪) আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে গোমরাহ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (৩৫) তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর তোমরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি নূহ্‌ (আ)-কে অবশ্যই তাঁর কওমের প্রতি (রসূলরূপে এ পয়গাম দিয়ে) প্রেরণ করেছি যে, "তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, [এবং 'ওয়াদ্দ' 'সূয়া' 'ইয়াগুছ' 'ইয়াউক' 'নসর' প্রভৃতি হাতেগড়া যেসব মূর্তিকে মনগড়া উপাস্য সাব্যস্ত করেছ, এগুলোকে বর্জন কর।" অতপর হযরত নূহ্‌ (আ) তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা করার কারণে] নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সাফ সাফ ভীতি প্রদর্শন করছি। (আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে,) নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। (তদুত্তরে) তাঁর কওমের কাফির-প্রধানরা বলতে লাগল—(আপনি যে নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন, আমাদের অন্তর তাতে সায় দিচ্ছে না। কারণ) আমরা তো আপনাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু মনে করি না। (মানুষ কি করে আল্লাহ্‌র নবী হতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।) আর (কতিপয় লোকের স্বীকৃতি ও আনুগত্যকে যদি নবুয়তের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়, তবে তাও গ্রহণযোগ্য

হবে না। কারণ) আমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট, ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না, (তদুপরি) তারাও শুধু ভাসাভাসাভাবে (আনুগত্য করে থাকে। কেননা, সুষ্ঠু বিচার বুদ্ধি না থাকার ফলে চিন্তা-বিবেচনা করেও তারা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অধিকন্তু তারা চিন্তা-ভাবনা করেও কাজ করেনি। কাজেই এহেন লোকদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য আপনার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ হতে পারে না। বরং তা আমাদের ঈমান আনার পথে অন্তরায়স্বরূপ। কারণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নীচাশয়দের সাথে সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে অপমান বোধ করে থাকেন। পক্ষান্তরে নীচাশয় ব্যক্তিরা শুধুমাত্র সম্পদ ও সম্মান হাসিলের জন্য যে কোন কাজ করতে পারে। সুতরাং তারাও আন্তরিকতার সাথে ঈমান আনেনি)। আর (যদি বলেন, যে, বিশেষ কোন গুণের কারণে আমাদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তাই তারা আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তাহলে বলব যে,) আমরা নিজেদের উপর আপনাদের (অর্থাৎ নবী ও তাঁর অনুসারীদের) কোন (শ্রেষ্ঠত্ব বা) প্রাধান্য দেখি না। (কাজেই আপনার বক্তব্য সত্য নয়। বরং আমরা আপনাদের সবাইকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি। (তখন) নূহ (আ) বললেন—হে আমার জাতি! (আমার নবুয়ত তোমাদের বোধগম্য ও মনঃপূত নয় বলে দাবি করছ।) আচ্ছা বল তো, আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর (কায়েম) থাকি (যা দ্বারা আমার নবুয়তের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে)। আর তিনি যদি আমাকে নিজের পক্ষ হতে (মেহেরবানী করে) রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) দান করে থাকেন; তারপরেও তা (অর্থাৎ নবুয়ত অথবা তার প্রমাণাদি) যদি তোমাদের বুঝে না আসে তাহলে (আমার কি দোষ?) আমি কি তা (অর্থাৎ উক্ত দাবি অথবা তার দলীল) তোমাদের উপর (জোর করে) চাপিয়ে দেব? আর তোমরা তা ঘৃণা করতে থাকবে? (অর্থাৎ আমার নবুয়ত তোমাদের বোধগম্য ও মনঃপূত না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে—তোমরা মনে কর যে, মানুষ কখনো আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর বা বার্তাবহ হতে পারে না। এটা তোমাদের একটি ভ্রান্ত ও অমূলক ধারণা মাত্র, যার সপক্ষে তোমাদের নিকট কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে এটা সম্ভব ও বাস্তব হওয়ার অকাট্য প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা আমার কাছে বর্তমান রয়েছে; উপরন্তু কারো খেয়াল-খুশির অনুসরণেই কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত বা বাতিল হয়ে যায় না। তাই নবুয়তের সপক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ রয়েছে, তা অনুসরণ করার জন্য নিরপেক্ষ চিন্তা-বিবেচনা অপরিহার্য। কিন্তু তোমরা সেরূপ চিন্তা-বিবেচনা কর না; আর জোর করে তোমাদের দ্বারা চিন্তা করানো আমার সাধ্যাতীত।) আর [নূহ্ (আ) আরও বললেন—] হে আমার জাতি! (চিন্তা করে দেখ তো, নবুয়তের মিথ্যা দাবি করলে তাতে আমার কোন স্বার্থ অবশ্য থাকত, আমি হয়ত তোমাদের অর্থ-সম্পদে ভাগ বসাতাম। কিন্তু তোমরা তো খুব ভাল করেই জান যে,) আমি এর (তবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে (ধন-সম্পদ ইত্যাদি) কোন বস্তু চাই না; আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। (তিনি পরকালে তা দান করবেন, আশা রাখি। অনুরূপভাবে নিরক্ষেপ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমার অন্য কোন স্বার্থও নেই। এতদসত্ত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর কেন? আমার

দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত কোন যুক্তিপ্রমাণ নেই। বরং দাবির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। অতএব, আমার নবুয়তে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।) আর (তোমরা দরিদ্র-দুর্বল লোকদের আনুগত্যকে নিজেদের ঈমান আনার পথে অন্তরায় মনে করছ এবং স্পষ্টত অথবা ইঙ্গিতে চাইছ যেন আমি তাদেরে নিজের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেই। তাই জেনে রাখ,) আমি তো ঈমানদারগণকে (নিজের কাছ থেকে) দূরে তাড়িয়ে দিতে পারি না। (কারণ) তারা অবশ্যই (সাদরে-সসম্মানে) তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। (শাহী দরবারের প্রিয়পাত্রকে কেউ তাড়িয়ে দেয় কি? এতদ্বারা বোঝা গেল যে, "দরিদ্র-দুর্বল ব্যক্তিরা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি"—বলে কওমের লোকেরা যে উক্তি করেছিল, তা মিথ্যা।) বরঞ্চ (অবাঞ্ছিত আচরণ ও অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণে) তোমাদেরকে আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি। আর হে আমার জাতি! (ধর, তোমাদের কথা অনুসারে) আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই, তাহলে (বল তো, তোমাদের মধ্যে) কে আমাকে আল্লাহ্‌র (পাকড়াও) হতে (রক্ষা করবে,) রেহাই দেবে? (তোমরা যারা এহেন বেহুদা পরামর্শ দিচ্ছ তোমাদের কারো সে ক্ষমতা নেই।) তোমরা কি তা চিন্তা করে দেখ না? আর (উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে তাদের উত্থাপিত সব প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে। পরিশেষে জবাবের উপসংহার টানা হচ্ছে যে, আমার নবুয়ত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরেও তা অস্বীকার করা মারাত্মক অপরাধ। বাস্তবিকপক্ষে এটা কোন অভিনব বা অসম্ভব দাবি ছিল না। যদি কোন অসম্ভব বা অলীক দাবি করা হত, তাহলে তা অমান্য ও অস্বীকার করা এত দূষণীয় ছিল না। কিন্তু দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে অবিশ্বাস করা চলে না। তবে দলীল-প্রমাণ দ্বারাও যদি কোন জিনিস অসম্ভব সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে অসম্ভবই বলতে হবে। কিন্তু আমি তো কোন মিথ্যা বা অবাস্তব দাবি করছি না। অতএব,) আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ধনভাণ্ডার রয়েছে; এবং আমি গায়েবের সব খবরও—জানি (এমন দাবিও করি না,) আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। (এতক্ষণ নিজের সম্পর্কে বলেছেন, অতপর নিজ অনুসারীদের সম্পর্কে বলছেন—) আর যারা তোমাদের দৃষ্টিতে হীন (লাঞ্ছিত তাদের সম্পর্কে) আমি (তোমাদের মত) একথা বলতে পারি না যে, (তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। সুতরাং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কোন সওয়াব দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করেই অবগত রয়েছেন। (হয়ত তাদের অন্তরে পূর্ণ ইখলাস রয়েছে। কাজেই আমি তাদের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা কেন করব?) এরূপ কথা বললে (তো) আমি অন্যায়কারীদের মধ্যে পরিগণিত হব। [কেননা, প্রমাণ ছাড়া এরূপ মন্তব্য করা নাজায়েয ও গোনাহ্। হযরত নূহ (আ) যখন তাদের সকল প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাব দান করলেন এবং তারা কোন প্রত্যুত্তর দিতে অপারক হল, তখন অনন্যোপায় হয়ে] তারা বলতে লাগল—হে নূহ (আ)! আপনি আমাদের সাথে তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন, যা হোক (তর্ক ক্ষান্ত করুন এবং) আপনি আমাদেরকে যে (আযাবের) ধমক দিচ্ছেন, তা (আমাদের উপর) নিয়ে আসুন, যদি

আপনি একজন সত্যবাদী ব্যক্তি হয়ে থাকেন। তিনি [হযরত নূহ (আ)] বললেন— (তা নিয়ে আসার আমার কোন ক্ষমতা বা অধিকার নেই। বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া, শুনিয়ে দেওয়া ও সতর্ক করা আমার কর্তব্য ছিল, আমি তা যথাসাধ্য পালন করেছি। কিন্তু তোমরা আমার কথা অগ্রাহ্য-অমান্য করে চলছ। অতএব) এটা (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত আযাব) তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলাই আনয়ন করবেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন; আর তখন তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না (যে, আল্লাহ্ আযাব দিতে চাইবেন আর তোমরা তা ঠেকিয়ে রাখবে)। আর আমি তোমাদের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে মমতা ও দরদের সাথে (তোমাদেরকে সুপথে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি) তোমাদের (যত বড় হিতাকাঙ্ক্ষীই হই না কেন এবং) যতই নসীহত করি না কেন, তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পথহারা করতে চান। (যার মূল কারণ হচ্ছে, তোমাদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও অহংকার। অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই যখন নিজেদের কল্যাণ সাধন করতে এবং অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে সচেষ্ট না হবে, তখন আমার একতরফা চেষ্টা ও আগ্রহে কি ফায়দা হবে?) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই) তোমাদের মালিক (আর তোমরা তাঁর গোলাম। অতএব, তাঁর প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ হুবহু পালন করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। অথচ, তোমরা ধৃষ্টতা, হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তাঁর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে চরম অপরাধী সাব্যস্ত হচ্ছ।) আর তাঁর সান্নিধ্যেই তোমাদের (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের ধৃষ্টতা, হঠকারিতা ও অহংকারের প্রতিবিধান করবেন। কি তারা বলে? এই কোরআন আপনি রচনা করে এনেছেন? তদুত্তরে আপনি (হে মুহাম্মদ!) বলে দিন (যে,) আমি যদি ইহা রচনা করে থাকি, তবে তা আমার অপরাধ (এবং তার দায়িত্বও) আমার উপর (তোমরা তার দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত)। আর (তোমরা যদি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাক, তবে) তোমাদের অপরাধের (পরিণাম ভোগ তোমরা করবে, তার) সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই (আমি তজ্জন্য দায়ী নই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ্ (আ) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আ) আল্লাহ্র হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাসাপেক্ষে কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

مَلَأ—'মালাউ' শব্দের সাধারণ অর্থ জামাত বা দল। কোন কোন ভাষাবিদ ইমামের মতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জামাতকে مَلَأ বলে।

بَشَر 'বাশার' অর্থ ইনসান বা মানুষ।

اَرَاذِل বহুবচন, তার এক একবচন, اَرْذَل অর্থ নীচাশয়, ইতর লোক; কওমের মধ্যে যাদের কোন মান-মর্যাদা নেই।

بَادِىَ الرَّاى 'বাদিয়ার রায়' অর্থ স্থূলবুদ্ধি, স্বল্পবুদ্ধি, ভাসাভাসা মতামত।

হযরত নূহ (আ)-র নবুয়ত ও রিসালতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল — مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো দেখি যে, আপনিও আমাদের মতই মানুষ মাত্র। আমাদের মত পানাহার করেন, হাটবাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল ও বার্তা-বাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে করত যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে রসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়. বরং ফেরেশতা হওয়া বান্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় জানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে এর জাবাবে ইরশাদ হয়েছে ঃ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ -

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী নয়। বরং চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বান্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তাঁর কাছে দীন শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হত, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হত। কেননা ফেরেশতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন

হন না। অতএব, তাঁরা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ তাঁবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে যা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহ্‌র নবী হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে—যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বর বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জিযাই তাঁর নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ্ (আ) বলেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র তরফ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করতে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছ।

কিন্তু পয়গম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহ্‌র রহমত জোরজবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়. যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধানের পরিপন্থী। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না। এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, জোর-জবরদস্তি কাউকে মু'মিন বা মুসলমান বানানো কোন নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টত বোঝা গেল যে, কোন ফেরেশতাকে নবী-রূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ, ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সবদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং, তাঁদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হত। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? আর কোন পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং 'ঈমান বিল-গায়েব' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল ঃ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا

بَادِيَ الرَّأْيِ অর্থাৎ আমরা দেখছি যে, আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে দুইটি দিক রয়েছে। এক, আপনার দাবি যদি সত্য ও সঠিক হতো, তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্রে গ্রহণ করত। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে; আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরাও আহম্মকরূপে পরিচিত ও ধিকৃত হব। দুই, সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোট লোকগুলি আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসাবে তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হব, নামাযের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং তাদের ঈমান কবূল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

বাস্তব জ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহিল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল—যাদের কাছে পার্থিব ধনসম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলত তা ছিল তাদের জাহিলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতি, ধন-দৌলত বা বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মত, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না, কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এর স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহবান সম্বলিত রসূলে-পাক (সা)-এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই এর তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা, সে তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্র করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী ঈমান আনয়ন করছে, না বিত্তশালী বড়-লোকেরা? তারা জবাব দিল, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী। তখন

হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, এ তো সত্য রসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই—যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তাঁর নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সওরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন—যারা বাদশাহ ও রাজ-কর্মচারীদের খোশামোদ-তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (র) বলেন, যারা দীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল—সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন—যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে-কিরাম (রা)-গণের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ, তাঁরাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরীয়তের আহকাম সকলের কাছে পেঁছেছে।

যা হোক, ৩৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলা হয়েছে যে, কারো ধনসম্পদের প্রতি নবী-রসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজেদের খিদমত ও তা'লীম-তবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাঁদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই, তাঁদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশংকা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়ত তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোক-দেরকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায়-অসঙ্গত।

مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ-এর আরেক অর্থও হতে পারে যে, ধরে নেওয়া যাক, আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই তাহলে কিয়ামতের দিন তারা যখন আল্লাহ্ পাক পরোয়ারদিগারের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ জানাবে, তখন আমি কি জবাব দেব?

৩০ নং আয়াতে একই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি তাদেরে তাড়িয়ে দেই, তাহলে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা পাকড়াও করবেন, তখন আমাকে আল্লাহর আযাব হতে কে রক্ষা করবে? পরিশেষে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, মানুষের জন্য নবুয়ত

প্রাপ্তিকে অসম্ভব মনে করা, দরিদ্রদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার আবদার করা ইত্যাদি সবই তাদের জাহিলিয়াত ও মূর্খতার লক্ষণ।

৩১ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ)-র বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা তিনি তাঁর কওমের প্রশ্ন ও আপত্তি শ্রবণ করার পর তাদের মৌলিক হিদায়েত দানের জন্য ব্যক্ত করেছেন। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ধন-ভাণ্ডার থাকা, গায়েবের খবর জানা, ফেরেশতা হওয়া প্রভৃতি যা কিছু তোমরা নবী-রসূলগণের জন্য আবশ্যক মনে করছ, আসলে তার একটিও নবুয়ত বা রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

তিনি প্রথমেই বলেছেন ঃ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে। এখানে তাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে। তারা বলত যে, তিনি যদি আল্লাহ্‌র নবীরূপে আগমন করে থাকেন, তবে তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ধন-ভাণ্ডার থাকা উচিত ছিল, যা থেকে তিনি লোকদেরকে সাহায্য দান করবেন। হযরত নূহ (আ) জানিয়ে দিলেন যে, পার্থিব ধনসম্পদে মানুষকে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রসূলগণ প্রেরিত হননি। বরং ধনসম্পদের মোহমুক্ত করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্যই তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। অতএব, ধন-ভাণ্ডারের সাথে তাঁদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।

সম্ভবত এখানে আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, নবী-রসূল এমনকি আল্লাহ্‌র ওলীগণকে পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদত্ত হয়েছে, তাদের হাতে আল্লাহ্‌র কুদরতের ভাণ্ডার তুলে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে যাকে খুশী তাঁরা দিতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখতে পারেন।—এহেন ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে হযরত নূহ (আ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের ভাণ্ডার কোন নবী-রসূলের হাতে তুলে দেননি। ওলী-আবদাল তো দূরের কথা। তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য নিজ অনুগ্রহে তাঁদের দোয়া ও চাহিদা স্বীয় মর্জি মুতাবিক পূরণ করে থাকেন।

হযরত নূহ (আ)-র দ্বিতীয় উক্তি ছিল ঃ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ "আর আমি গায়েবও জানি না।" কেননা, উক্ত জাহিলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গম্বর, তাঁরা নিশ্চয়ই গায়েবের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আ) এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুয়ত ও রিসালতের জন্য গায়েবের ইলম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়েবের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সিফত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, ওলী বা ফেরেশতা তার অংশীদার হতে পারে না। তাঁদের অল্প গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শিরকী। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় পয়গম্বরগণের মধ্যে যাঁকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের ইলম দান করেন। তা নবী-ওলীগণের ইখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তাঁরা যখন-তখন যে-কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন অবহিত করেন, তখন তাঁদের জন্য

উহা আর গায়েব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল-গায়েব বলা হারাম ও শিরকী।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হয়েছে ঃ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ "আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।" এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী-রসূল রূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বান্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে—তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লান্ছিত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মত এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করবেন না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণ ও কামিয়াবী ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উহা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ) বলেন, তোমাদের মত আমিও যদি দরিদ্র ঈমান-দারগণকে লান্ছিত-অবান্ছিত মনে করি, তাহলে আমিও জালিমরূপে পরিগণিত হবো।

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا
تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ
الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ
إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ
فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

(৩৬) আর নূহ (আ)-র প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (৩৭) আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মুতাবিক একটি নৌকা তৈরি করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। (৩৮) তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাকে বিদ্রূপ করত। তিনি বললেন, তোমার যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদেরে উপহাস করছি। (৩৯) অতপর অচিরেই জানতে পারবে—লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। (৪০) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুইটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদেরে বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সুদীর্ঘকালব্যাপী উপদেশ দান করা সত্ত্বেও যখন দেখা গেল যে, কোন ফল হচ্ছে না, তখন) নূহ (আ)-র প্রতি ওহী নাযিল করা হল যে, (আপনার কওমের) যারা ঈমান আনার (যোগ্য ছিল তারা ইতিমধ্যেই) ঈমান এনেছে, (ভবিষ্যতে) আপনার কওম হতে অন্য কেউ (আর) ঈমান আনবে না। (অতএব) তারা (কুফরী-শিরকী, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নিপীড়ন-নির্যাতন ইত্যাদি) যা কিছু করছে আপনি (তাদের কার্যকলাপে) বিমর্ষ হবেন না। (কেননা, অপ্রত্যাশিত ব্যাপারেই মানুষ বিমর্ষ হয়ে থাকে। তাদের থেকে যেহেতু অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আপনি বিমর্ষ হবেন কেন?) আর (তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি অচিরেই তাদেরে ডুবিয়ে মারার ফয়সালা করেছি, আর এতদুদ্দেশ্যে এক মহাপ্লাবন সমাগত প্রায়। অতএব, আপনি উক্ত প্লাবন হতে আত্মরক্ষার্থে) আমার তত্ত্বাবধানে আমারই নির্দেশ অনুসারে একখানি নৌকা তৈরি করুন (যাতে আরোহণ করে আপনি স্বীয় পরিজনবর্গ ও ঈমানদারগণসহ নিরাপদে থাকেন)। আর (মনে রাখবেন,) কাফিরদের রক্ষার ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। (কেননা, তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়ে গেছে যে,) তারা সবাই নিমজ্জিত হবে। (কাজেই তাদের জন্য সুপারিশ করা নিরর্থক।) অতপর [নূহ (আ) নৌকা তৈরির উপকরণাদি সংগ্রহ করলেন এবং] তিনি (নিজে অথবা কারিগরের সাহায্যে) নৌকা তৈরি করতে লাগলেন। আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয়রা যখন উহার পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন (ডাঙ্গায় নৌকা তৈরি করতে দেখে এবং মহা-প্লাবনের কথা শুনে) তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত যে, চেয়ে দেখ, ধারে-কাছে কোথাও পানির নাম-গন্ধ নেই, অথচ ইনি এ অর্থহীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন

তখন) তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক; তবে তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। (অর্থাৎ আযাব তোমাদের এত নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাকে উপহাস করছ। তোমাদের অবস্থা দেখে বরং আমারই হাসি পায়। যা হোক,) অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, (দুনিয়াতেই) লাঞ্ছনাজনক শাস্তি কার উপর আপতিত হয় এবং (মৃত্যুর পরে) চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে! (সারকথা, প্রায় প্রতিদিনই এভাবে তর্ক-বিতর্ক, বাক-বিতণ্ডা অব্যাহত ছিল।) অবশেষে যখন আমার (আযাবের) হুকুম এসে পৌঁছল এবং (প্লাবনের পূর্বনির্ধারিত সংকেতস্বরূপ) ভূপৃষ্ঠ (হতে পানি) উথলিয়ে উঠতে লাগল (এবং আকাশ হতে বর্ষণ আরম্ভ হলো, তখন) আমি [নূহ (আ)-কে] বললাম, (মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এবং পানির মধ্যে জীবিত থাকতে অক্ষম) সর্বপ্রকার জীব থেকে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী মোট দুইটি করে (নৌকায় তুলে নিন;) এবং যাদের সম্পর্কে ইতিমধ্যেই (ডুবে মরার চূড়ান্ত) ফয়সালা হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলুন। (অর্থাৎ যেসব কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ "নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে" বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের নৌকায় আরোহণ করাবেন না।) বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল (অতএব, শুধু এরাই নৌকায় আরোহণের সুযোগ পেয়েছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতপর হুশ হলে পরে দোয়া করতেন—আয় আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বুঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হয়ত তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন ঃ

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্য পথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। —(সূরা নূহ)

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করলেন ঃ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ হে আল্লাহ্! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা, ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।—(১৮ পারা, আয়াত ৩৯) সূরা আল-মু'মিনুন।)

দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন।—(বগভী ও মাযহারী)

৩৩ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আযাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরি করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন উহাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ্ (আ) নৌকা তৈরি করলেন। অতপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। নূহ (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হল সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করাবার জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়ার আদেশ দেয়া হল। তিনি আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হল, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন—হযরত নূহ (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছিল যে, তাঁর জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে।

নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত নূহ (আ)-র মুখে তাঁর কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল ঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۔ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۔

অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার! এখন এই কাফিরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফির হবে।—(পারা ২৯, সূরা নূহ, আয়াত ২৬)

এই বদদোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হল, যার ফলে সমস্ত কওমে নূহ (আ) ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আ)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান ঃ হযরত নূহ (আ)-কে যখন নৌকা তৈরির নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরি করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا "আর আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত নূহ (আ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উঁচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। উহার দুই পার্শ্বে অনেকগুলি জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আ)-র হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে ঃ হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত 'আত-তিরবুন-নববী' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোন নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ)-এর প্রতি যেসব ওহী নাযিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল

ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা, চলতি গাড়ী হযরত আদম (আ)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ী আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ী সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নবী হযরত আদম (আ) ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এ দ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন সুপারিশ যেন না করেন।

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরিকালীন সময়ে নূহ (আ)-র কওমের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে হযরত নূহ (আ) যখন নৌকা নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত—আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন যে, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত—"এখানে তো পান করার মত পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।" তদুত্তরে হযরত নূহ (আ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখ সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতপক্ষে নবীগণ কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী বরং হারাম। কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

অর্থাৎ "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহ্‌র কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর।" (পারা ২৬, সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত) সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া। সেমতে "আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব" বাক্যের অর্থ হচ্ছে—তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে,

"ইহা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।" যেমন ৩৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাকর আযাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আযাব কাদের উপর হয়। প্রথম عذاب শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং عذاب مقيم দ্বারা আখিরাতের চিরস্থায়ী আযাব উদ্দেশ্য।

৪০ নং আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ

অর্থাৎ "অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হল এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।"

التَّنُّوْرُ -তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানোর তন্দুরকেও তান্নুর বলে, যমীনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন—এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আ)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عين ورده 'আইনে আরদাহ' নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুর অভ্যন্তর হতেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন—এখানে হযরত নূহ (আ)-এর তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে—যা কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী (র), মুজাহিদ (র), শা,বী (র), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসির এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (র) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কূফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ্ (আ) তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশদ্বার।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে। —(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্লাবন যখন শুরু হয়েছে তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উঁচু যমীন হতেও পানি উঠেছে।

সিরিয়ার আইনুল আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কূফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়েই সব একাকার হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

অর্থাৎ "অতপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবহমান করলাম।—(২৭ পারা, সূরা আল কামার, আয়াত—১১)

ইমাম শা'বী (র) আরো বলেছেন যে, কূফার এই জা'মে মসজিদটি মসজিদে-হারাম, মসজিদে-নববী ও মসজিদে-আকসার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ্ (আ)-কে হুকুম দেয়া হল ঃ

احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

অর্থাৎ "জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।" এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ্ (আ)-র জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখি উঠানো হয়েছিল। জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখি কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা ঐ সন্দেহ দূরীভূত হল যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকুলের স্থান সংকুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো ?

অতপর হযরত নূহ্ (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফিরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ্ (আ)-র তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস ও তাদের ৩ জন স্ত্রীও ছিল। নূহ্ (আ)-র চতুর্থ পুত্র কেন'আন কাফিরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছে।

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادٰى نُوحٌ ابْنَهُ
وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾
قَالَ سَاٰوِي إِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يٰأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ
الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾

(৪১) আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান। (৪২) আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ (আ) তার পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সাথে থেক না। (৪৩) সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ্ (আ) বললেন, আজিকার দিনে আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (৪৪) আর নির্দেশ দেয়া হল---হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল 'দুরাত্মা কাফিররা নিপাত যাক।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর নূহ (আ) (নৌকায় আরোহণ করিয়ে স্বীয় অনুগামীদেরকে) বললেন, (এস,) তোমরা (সবাই) এতে (এই কিশতিতে) আরোহণ কর, (ডুবে যাওয়ার কোন আশংকা করো না। কেননা,) এর গতি ও এর স্থিতি (সবই একমাত্র) আল্লাহ্‌র নামে। (তিনিই এর হিফাযতকারী, অতএব আশংকার কোন কারণ নেই। বান্দাদের পাপ-তাপ তাদেরে ডুবাতে চাইলেও) আমার পালনকর্তা বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়, কোন সন্দেহ নেই। (তিনি নিজ রহমতে অপরাধ মার্জনা করেন, অধিকন্তু হিফাযত

করেন। সারকথা, সবাই নিশ্চিন্তে নৌকায় আরোহণ করল। ইতিমধ্যে পানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল) আর (উক্ত) কিশতিখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে; আর নূহ (আ) তাঁর (এক) পুত্রকে (যার নাম ছিল কেনআন; যাকে অনেক বোঝানো সত্ত্বেও ঈমান আনেনি, তাকে কিশতিতে আরোহণ করতে দেয়া হয়নি। তখন পর্যন্ত কিশতি কূলেই ছিল।) আর সে (কিশতি হতে আলাদা স্থানে অর্থাৎ কিনারায়) সরে (দাঁড়িয়ে) ছিল, (শেষবারের মত) ডেকে বললেন—প্রিয় বৎস! (কিশতিতে আরোহণ করার পূর্বশর্ত পূরণ করত অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করে সত্বর) আমাদের সাথে (কিশতিতে) আরোহণ কর, আর (আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে) কাফিরদের সাথে থেক না। (অর্থাৎ কুফরী ও শিরকী আকীদা পরিত্যাগ কর নতুবা সলিল সমাধি লাভ করবে।) সে (তৎক্ষণাৎ) বলল, আমি (এক্ষুণি) কোন (উঁচু) পাহাড়ের (শীর্ষে) আশ্রয় গ্রহণ করব, যা আমাকে পানি হতে (নিরাপদে) রক্ষা করবে। (বস্তুত তখন প্লাবনের প্রাথমিক অবস্থা ছিল এবং পর্বতশীর্ষে তখন পর্যন্ত পানি পৌঁছেনি।) নূহ্ (আ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার (আযাবের) হুকুম হতে কোন রক্ষাকারী নেই। (পাহাড় পর্বত বা অন্য কোন শক্তির দ্বারা কাজ হবে না।) তবে আল্লাহ্ পাক (স্বয়ং) যাকে অনুগ্রহ করবেন, (তাকে তিনিই রক্ষা করবেন। যা হোক, হতভাগা কেন্'আন তখনও ঈমান আনল না, প্রবল বেগে পানি বাড়ছিল)। আর এমন সময় তাদের (পিতা-পুত্র) উভয়ের মাঝে (এক বিশাল) তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, এতে সে (কেন-'আনও অন্যান্য) কাফিরদের মত নিমজ্জিত হল। আর (সমস্ত কাফির নিমজ্জিত হওয়ার পর) নির্দেশ দেয়া হল, হে পৃথিবী, তোমার (উপরিস্থিত সব) পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, (বর্ষণ হতে) ক্ষান্ত হও। (উভয় নির্দেশ তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হল,) আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ যা হওয়ার ছিল হয়ে গেল। আর কিশতি এসে জুদী পাহাড়ে ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল—কাফিররা রহমত হতে দূরীভূত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ নং আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে আরোহণ করবে।

مَجْرٖى 'মাজরে' অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مُرْسٰى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহ্র নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি ও কুদরতের অধীন।

প্রতিটি যানবাহনের গতি স্থিতি আল্লাহ্‌র কুদরতের অধীনঃ সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান ও শূন্যযান অথবা কোন জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা তৈরী করা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূল দৃষ্টিতে মানুষ হয়ত এই বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা এটা তৈরি করেছি, আমরা এটা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটার লোহা-লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লৌহ বা এক ইঞ্চি কাঠও তৈরী করার ক্ষমতা তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারি যন্ত্রাংশ তৈরী করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত তাহলে দুনিয়ায় কোন নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরি হয়। অতপর শত-শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে যমীনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য, তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুৎরূপে হোক বা জ্বালানি তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন তন্মধ্যে কোন্‌টি মানুষ সৃষ্টি করেছেন? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তেল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে? এর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায় তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হিফাযত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا -একমাত্র আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মাত্র দুই শব্দ বিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুত এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যদ্দ্বারা মানুষ বস্তু জগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মু'মিনের দুনিয়াদারী ও কাফিরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মু'মিন যখন কোন যানবাহনে আরোহণ করে তখন সে শুধু যমীনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ্ (আ)-র সকল পরিজন-বর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু 'কেনআন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশত হযরত নূহ্ (আ) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফিরদের সাথে থেক না, পানিতে ডুবে মরবে। কাফির ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগসাজশ ছিল এবং সে নিজেও কাফির ছিল। কিন্তু হযরত নূহ্ (আ) তার কাফির হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহবানের মর্ম হবে—নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফিরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেনআন' তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল---আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আ) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে—আজকে কোন উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্র খাস রহমত ছাড়া আজ বাঁচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ্ (আ)-র তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল।

৪৪ নং আয়াতে প্লাবন সমাপ্তি ও পরিবেশ শান্ত হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিলেন ঃ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ অর্থাৎ "হে যমীন, তোমার সব পানি গিলে ফেল।" অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি যমীন উদগীরণ করেছিল, সে সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হল যেন যমীন তা শুষে নেয়। আকাশকে অর্থাৎ মেঘমালাকে নির্দেশ দিলেন—"ক্ষান্ত হও, বারি বর্ষণ বন্ধ কর।" ফলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হল, যমীনের পানি ভূ-অভ্যন্তরে চলে গেল। আর আসমান হতে ইতিপূর্বে বর্ষিত পানি নদ-নদীর আকার ধারণ করল---যা দ্বারা পরবর্তীকালে মানব সমাজ উপকৃত হতে পারে।—(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যমীন ও আসমানকে সম্বোধন করে নির্দেশ দান করেছেন। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন অনুভূতিসম্পন্ন বস্তু নয়। তাই কেউ কেউ এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের যেসব বস্তু অনুভূতিহীন নির্জীব জড় পদার্থ মাত্র, আসলে তা সবই

অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রাণবিশিষ্ট। অবশ্য তাদের আত্মা ও অনুভূতি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পর্যায়ের নয়। তাই তাদের প্রাণহীন ও অনুভূতিহীন সাব্যস্ত করে শরীয়তের বিধি-নিষেধ হতে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে ঃ যেমন—وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ "এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্‌র হামদ ও তসবীহ পাঠ করছে না।" আর একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র মারিফত ও পরিচয় ছাড়া হামদ ও তসবীহ পাঠে সক্ষম হওয়া সম্ভব নয় আর পরিচয় লাভের জন্য জ্ঞান ও অনুভূতি থাকা অপরিহার্য। অতএব উপরোক্ত আয়াতে করীমা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যথাযোগ্য অনুভূতি রয়েছে, যা দ্বারা সে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে ও জানতে পারে; স্রষ্টা তাকে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন, কোন্ কাজে নিয়োজিত করেছেন, তাও উত্তমরূপে জানে এবং তা পূরণ করার জন্য আত্মনিয়োজিত থাকে। কোরআন পাকের আয়াতে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ -এর মধ্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে আসমান ও যমীনকে সরাসরি সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বললে কোন অসুবিধা নেই। মাওলানা রূমী (র) বলেন ঃ

خاک و باد و آب و آتش زندہ اند - با من و تو مردہ با حق زندہ اند

"মাটি, বায়ু, আগুন ও পানিরও প্রাণ আছে। আমার ও তোমার কাছে তা প্রাণহীন, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জীবন্ত।"

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যমীন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেওয়া হল যে, দুরাত্মা কাফি-ররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। এটা হযরত নূহ (আ)-এর মূল আবাসভূমি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে উমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুত এটি একটি পর্বতমালার অংশ বিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-র কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ (আ) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌঁছল, তখন সাতবার কা'বা শরীফের তাওয়াফ করল। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ (আ) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোযা পালন করেছিল।—(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

পূর্ববর্তী নবীগণের সব শরীয়তেই মুহাররম মাসের দশম তারিখে অর্থাৎ আশুরার দিনটিকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আশুরার রোযা ফরয ছিল। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আশুরার রোযা ফরয থাকেনি, তবে তা সুন্নত ও বিশেষ সওয়াবের কাজ হিসাবে সর্বদা পরিগণিত।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ
اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ
اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ
اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ
اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ
عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۭ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ
مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَاۗءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ
مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۭ اِنَّ
الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

(৪৫) আর নূহ (আ) তার পালনকর্তাকে বললেন—হে পরওয়ারদিগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য

আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী। (৪৬) আল্লাহ্ বলেন—হে নূহ্! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার! সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না যার খবর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (৪৭) নূহ্ (আ) বলেন—হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় চাইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো! (৪৮) হুকুম হল—হে নূহ্ (আ)! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দিব। অতপর তাদের উপর আমার দারুণ আযাব আপতিত হবে। (৪৯) এটা গায়েবের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে; তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[নূহ (আ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনয়ন করতে কিনআন যখন অস্বীকার করল, তখন সে নিমজ্জিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত তার অন্তরে ঈমান ঢেলে দিবেন এবং সে ঈমান আনয়ন করবে এ আশায়] হযরত নূহ্ (আ) স্বীয় পরওয়ার-দিগারকে বললেন—হে পরওয়ারদিগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনভুক্ত আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য (যে, পরিজনবর্গের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদেরে আপনি রক্ষা করবেন)। আর (যদিও সে বর্তমান ঈমানদার না হওয়ার কারণে পরিত্রাণ লাভের অযোগ্য, কিন্তু) আপনি তো আহকামুল হাকিমীন (সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সর্বশক্তিমান। আপনার অসাধ্য কিছুই নেই। আপনি ইচ্ছা করলে তাকে ঈমান দান করে কিশতিতে আরোহণের যোগ্য করতে পারেন। বস্তুত এটা ছিল কিনআনের ঈমান-দার হওয়ার জন্য দোয়া স্বরূপ)। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন—হে নূহ (আ), (আমার অনাদি ইলম অনুসারে) সে (কিনআন) আপনার পরিজনভুক্ত নয়, (অর্থাৎ যারা ঈমানের বদৌলতে নাজাত হাসিল করবে, তাদের মধ্যে নয়—ঈমান আনার সৌভাগ্য তার হবে না। বরং) সে (অন্তিমকাল পর্যন্ত) অবশ্যই দুরাচার (কাফির থাকবে। সুতরাং আমার কাছে এমন কোন দোয়া বা) দরখাস্ত করবেন না যার (আসল) খবর আপনার জানা নাই। আমি আপনাকে নসীহত করছি যে, আপনি (অজ্ঞদের) দলভুক্ত হবেন না। নূহ (আ) বললেন—হে আমার প্রভু। আমার যা জানা নেই (ভবিষ্যতে) এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইতেছি; (এবং পূর্বকৃত ত্রুটি মার্জনার প্রার্থনা করছি। কেননা) আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব, [ধ্বংস হয়ে যাব। জুদী পাহাড়ে কিশতি নোঙ্গর

করার কয়েক দিন পরে যখন পানি হ্রাস পেল, তখন হযরত নূহ (আ)-কে] বলা হল (অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সরাসরি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে বললেন---) হে নূহ (আ), (এখন জুদী পাহাড় হতে সমতল ভূমিতে) অবতরণ করুন, আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা ও বরকত সহকারে যা নাযিল হবে আপনার নিজের উপর ও আপনার সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর। (কারণ, তাঁরা সবাই ঈমানদার ছিলেন। একই কারণে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মু'মিন-মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র তরফ হতে সালামতি ও বরকত নাযিল হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে।) আর (পরবর্তী যুগে এদের বংশধরদের মধ্য হতে অনেক লোক কাফিরও হবে, তাই তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে) এমন অনেক সম্প্রদায় হবে, যাদের আমি (পার্থিব জীবনে সাময়িকভাবে) উপকৃত হতে দেব। অতপর (কুফরী ও শিরকীর কারণে পরকালে) তাদের উপর আমার দারুণ আযাব আপতিত হবে। এই কাহিনী [হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার জন্য ও আপনার জাতির জন্য] গায়েবের খবরসমূহের মধ্যে একটি (খবর), যা ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে পৌঁছাচ্ছি! (ওহীর) পূর্বে এ আপনিও জানতেন না এবং আপনার জাতিও জানত না। (সে হিসাবে) এটা ছিল গায়েবের খবর। (আর একমাত্র ওহী ছাড়া এটা জানার অন্য কোন উপায় ছিল না। অতএব, প্রমাণিত হচ্ছে যে,) আপনি ওহীর মাধ্যমে অত্র কাহিনী অবহিত হয়েছেন। এতদ্বারা আপনার নবুয়ত ও রিসালত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হল। এতদসত্ত্বেও মক্কার কাফিররা আপনার বিরোধিতা করছে। যা হোক, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। [যেমন ইতিপূর্বে হযরত নূহ (আ)-এর চরম ধৈর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা,] যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য কল্যাণকর পরিণাম (রয়েছে,) কোন সন্দেহ নেই। [যেমন হযরত নূহ (আ) ও তাঁর কওমের ঘটনায় দেখা গেছে যে, কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছে আর ঈমানদারগণের পরিণাম কল্যাণপ্রসূ হয়েছে। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগের কাফির বেঈমানদের দাপট সাময়িক ব্যাপার, পরিশেষে সত্য ও ন্যায়ের বিজয় অবধারিত।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য ৫টি আয়াতে হযরত নূহ (আ)-র তুফান সংক্রান্ত অবশিষ্ট কাহিনী ও সংশ্লিষ্ট হিদায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ)-র পুত্র কিনআন যখন মহান পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য ও আহবানকে প্রত্যাখ্যান করল তখন তার ধ্বংস অনিবার্য দেখে হযরত নূহ (আ)-র পিতৃস্নেহ ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল-ইজ্জতের মহান দরবারে আরয করলেন, হে প্রভু! আপনি আমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আপনার ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক। কিন্তু অবস্থা দেখছি যে, আমার পুত্র কিনআন তুফানে মারা পড়বে। এখনও তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি তো আহকামুল হাকিমীন, আপনি সর্বশক্তিমান। অতএব, আপনি নিজ ক্ষমতাবলে তাকে রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি।

৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত নূহ্ (আ)-র প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফির। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোন আবেদন করা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞ-সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসীহত করছি।

আল্লাহ্ তা'আলার অত্র ফরমানের মধ্যে দুটি বিষয়ই জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ্ (আ) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফির হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। বরং তার মুনাফিকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে,—وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ— "অতপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোন অবাধ্য কাফিরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।"—এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে এটা কুফরী অবস্থায় কিনআনকে রক্ষা করার আবদার ছিল না। বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আকুল আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ)-র মত একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালমত না জেনেশুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন নি। বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার জন্য এটা এমন একটা ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফির ও জালিমের জন্য দোয়া করা জায়েয নয়ঃ উপরোক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাস'আলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে—তা জায়েয, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেওয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তফসীরে বয়জাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনেশুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম হবে।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুযর্গানের নীতি হচ্ছে, যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে, পীর-বুযর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে

যে, এ ব্যক্তি জালিম ও অন্যায়কারী অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোন চাকরি বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনেশুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না ঃ এখানে আরো জানা গেল যে, মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই! ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে! যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد
فدائے یک تن بیگانه که آشنا باشد

অর্থাৎ হাজারো আপন লোক আল্লাহ্‌র খাতিরে পর হয়েছে। আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গিত পরও আপন হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে নি। বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তারা যে-কোন বংশের, যে-কোন গোত্রের, যে-কোন বর্ণের, যে-কোন দেশের, যে-কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ - 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়। এ তত্ত্বটি কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জবানীতে অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব বাতিল মা'বুদের উপাসনা করছ সেসব উপাস্যের প্রতিও বিরক্ত।

—(২৮ পারা, সূরা মুমতাহানাহ, আয়াত ৪)

আলোচ্য আয়াতে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি دينى معاملات 'ধর্মীয় ব্যাপারের শর্ত' অতিরিক্ত আরোপ করেছি। কেননা দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে সুষ্ঠু লেনদেন, ভাল আচার-ব্যবহার, পরোপকার, দয়াশীলতা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে-কোন ব্যক্তির সাথে তা করা জায়েয, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হযরত রসূলে করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সদ্ব্যবহার, কাফির ও অমুসলিমদের প্রতি তাদের উদারতা ও সদয় ব্যবহারের অসংখ্য ঘটনা এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে আঞ্চলিক, ভৌগোলিক, বর্ণগত ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী, আরবী, হিন্দী, সিন্ধীরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তারূপে পরিগণিত হচ্ছে। এহেন জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শের পরিপন্থী তথা রসূলে করীম (সা)-এর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহের শামিল।

৪৭ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ) কর্তৃক পেশকৃত ওজরখাহীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে—সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া মাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, অন্যায় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য কামনা, অতীত দোষত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে তাঁর অনুগ্রহের জন্য আবেদন।

এতদ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের কোন ভুলত্রুটি হওয়ার পর ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শুধু নিজের সংকল্প ও দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে কাজ হবে না। বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করবে এবং দোয়া করবে যে, আয় পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে নিজ কুদরত ও রহমতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাপ-তাপ হতে রক্ষা করুন!

৪৮ নং আয়াতে তুফানের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্লাবনের উদ্দেশ্য যখন সাধিত হল, তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে বৃষ্টিপাত বন্ধ হল, যমীনের পানি যমীন গ্রাস করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, হযরত নূহ (আ)-র কিশতি জুদী পাহাড়ে ভিড়ল, অবশিষ্ট বৃষ্টির পানি নদ-নদীরূপে সংরক্ষিত হল। ফলে যমীন মানুষের বসবাসের যোগ্য হল। হযরত নূহ (আ)-কে পাহাড় হতে সদলবলে সমতল ভূমিতে অবতরণের হুকুম দিয়ে বলা হল, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। কেননা, আপনার প্রতি আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা থাকবে, অথবা সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা দেয়া হল এবং আপনার ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দের মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্যের নিশ্চয়তা দেয়া হল।

কোরআন করীমের এই ইরশাদ অনুযায়ী প্লাবন-পরবর্তীকালের সমস্ত মানবমণ্ডলী হযরত নূহ (আ)-র বংশধর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ—"আর শুধু তাঁর বংশধরকেই আমি অবশিষ্ট

রেখেছি।" এ জন্যই ইতিহাসবেত্তাগণ হযরত নূহ (আ)-কে দ্বিতীয় আদম উপাধিত ভূষিত করেছেন।

নিরাপত্তা ও বরকতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা শুধু হযরত নূহ (আ)-র সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইরশাদ হয়েছেঃ وَعَلٰى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ "আর আপনার সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপরও সালামতি ও বরকত রয়েছে।" এখানে হযরত নূহ (আ)-র সহযাত্রী ঈমানদারগণকে أُمَمٌ বলা হয়েছে, যা أُمَّةٌ উম্মত এর বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, কিশতিতে আরোহণকারীরা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অথচ ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, কিশতির আরোহিগণ অধিকাংশ হযরত নূহ (আ)-র খান্দানের লোক ছিল। আঙ্গুলে গোনা কয়েকজন মাত্র অন্য বংশের ছিল। এতদসঙ্গেও তাদের প্রতি أُمَمٌ مِّمَّنْ مَّعَكَ শব্দ প্রয়োগ করে বোঝান হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের বংশধরদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হবে। কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত বংশধরগণকে সালামতি ও বরকতের শামিল করা হয়েছে।

অতএব, এখানে সালামতি ও বরকতের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যেমন মু'মিনও থাকবে, তদ্রূপ বহু জাতি কাফির, মুশরিক ও নাস্তিকও হয়ে যাবে। মু'মিনদের জন্য তো দুনিয়া ও আখিরাতে সালামতি ও বরকত রয়েছে। কিন্তু তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফির, মুশরিক, নাস্তিক তারা তো জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের জন্য নিরাপত্তা ও বরকত কিভাবে হতে পারে? আয়াতের শেষ বাক্যে তার জবাব দেয়া হয়েছে যেঃ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ অন্যান্য সম্প্রদায়কেও আমি পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য দান করব, সর্বপ্রকার ভোগবিলাসের সামগ্রী দ্বারা সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেব। কেননা, পার্থিব নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য সাধারণ দস্তারখান-স্বরূপ; শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই তা উপভোগ করতে পারে। অতএব, কিশতি আরোহিগণের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যারা কাফির হবে তারাও এর অংশীদার হবে। কিন্তু আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী শুধু ঈমানদারদের জন্য সংরক্ষিত। কাফিরদের সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান ইহজীবনেই বুঝিয়ে দেয়া হবে। অতএব, আখিরাতে তাদের উপর শুধু আমার আযাবই নির্ধারিত রয়েছে।

হযরত নূহ (আ)-র যমানায় সংঘটিত মহাপ্লাবনের বিস্তারিত বিবরণ হুযূর (সা) ওহীর মাধ্যমে অবহিত হয়ে স্বীয় দেশবাসীকে শুনালেন, ওহীর পূর্ব পর্যন্ত এসব ঘটনা তিনিও জানতেন না, তাঁর দেশবাসীও জানত না। একমাত্র ওহী ছাড়া তা জানার কোন উপায়-উপকরণও তাদের কাছে ছিল না। সমগ্র জাতি যে ঘটনা সম্পর্কে

বেখবর এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও যেহেতু বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কখনো বিদেশে যান নি, সুতরাং এটা জানার একমাত্র পন্থা ওহী সাব্যস্ত হল। আর ওহীপ্রাপ্ত হওয়াই নবুয়ত ও রিসালতের অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে রসূলে আকরাম (সা)-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, আপনার নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতার পক্ষে সূর্যের চেয়ে ভাস্বর অনস্বীকার্য যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কতিপয় বদবখত যদি আপনাকে অমান্য করে, আপনার সাথে কলহ করে, আপনাকে কষ্ট-ক্লেশ দেয়, তাহলে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বর হযরত নূহ (আ)-র ঘটনাবলী চিন্তা করুন। তিনি প্রায় এক হাজার বছর যাবত অপরিসীম কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন, আপনি তাঁর মত ধৈর্য অবলম্বন করুন। কারণ, পরিশেষে আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণই কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করবেন।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَا قَوْمِ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا هُودُ
مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ
قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ
دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي
عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ
إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۖ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۗ
جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ
عَنِيْدٍ ﴿٥٩﴾ وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ
عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿٦٠﴾ ع وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ
صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ هُوَ
اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ
تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا
مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۗ وَاِنَّنَا
لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ
كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰىنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ
مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾ وَيٰقَوْمِ
هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ
وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوْهَا
فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ
مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ
الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ

دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا
كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۝

(৫০) আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন---হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবূদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (৫১) হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন মজুরি চাই না; আমার মজুরি তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বুঝ না? (৫২) আর হে আমার কওম! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না। (৫৩) তারা বলল---হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নি, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেবদেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। (৫৪) বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন---আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সাথে, যাদেরকে তোমরা শরীক করছ; (৫৫) তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহ্‌র উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদিগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণ-কারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে, সন্দেহ নেই। (৫৭) তথাদি যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌঁছিয়েছি, যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তার কিছুই বিগড়াতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদিগারই প্রতিটি বস্তুর হিফাযতকারী। (৫৮) আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদার-গণকে পরিত্রাণ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করি। (৫৯) এ ছিল 'আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উদ্ধত বিরোধীদের আদেশ পালন করেছে। (৬০) এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা'নত রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও; জেনে রাখ, 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি 'আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (৬১) আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন---হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই, তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান

করেছেন। অতএব, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতপর তারই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (৬২) তারা বলল, —হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যার পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। (৬৩) সালেহ বললেন—হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তাঁর থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না। (৬৪) আর হে আমার জাতি আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। (৬৫) তবু তারা এটার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন—তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। এটা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) অতপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (৬৭) আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল! আরো শুনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি 'আদ জাতির প্রতি তাদের (গোত্রীয় বা দেশীয়) ভাই হযরত হুদ (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) প্রেরণ করেছি। তিনি স্বীয় (জাতিকে) বললেন—হে আমার জাতি, (তোমরা একমাত্র) আল্লাহ্‌র (ইবাদত) বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া আর কেউ তোমার মাবূদ হওয়ার যোগ্য নেই। তোমরা (এই প্রতিমা পূজার বিশ্বাসের নিরেট) মিথ্যাবাদী। (কেননা, যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এর অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।) হে আমার জাতি (আমার নবুয়তের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ এই যে,) আমি (আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের সুবাদে) তোমাদের কাছে কোন মজুরি চাই না। আমার পারিশ্রমিক ঐ আল্লাহ্‌র কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তথাপি তোমরা কেন বুঝ না? (নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও সন্দেহ পোষণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।) আর হে আমার দেশবাসী, তোমরা নিজেদের (শিরকী, কুফরী ইত্যাদি গোনাহ্ হতে) পরওয়ারদিগারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈমান আনয়ন কর)। অতপর (ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে) তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। (অর্থাৎ নেক আমল কর, তাহলে ঈমান ও ইবাদতের বদৌলতে) তিনি তোমাদের উপর (প্রচুর পরিমাণে) বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন।

(দুররে-মনসূর কিতাবে বর্ণিত আছে যে, 'আদ জাতির উপর একাদিক্রমে তিন বছর যাবত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ চলেছিল। তাই তারা বৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।) আর (ঈমান ও আমলের বরকতে) শক্তিদান করে আমাদের (বর্তমান) শক্তিকে (আরো) বৃদ্ধি করবেন। (অতএব, সত্বর ঈমান আনয়ন কর) এবং অপরাধীরূপে (ঈমান হতে) বিমুখ হয়ো না। (তদুত্তরে তারা বলল)—হে হুদ (আ)! তুমি (আল্লাহ্‌র রসূল হওয়ার সপক্ষে) আমাদের কাছে কোন দলীল (প্রমাণ) নিয়ে আসনি। (তাদের এই উক্তি ছিল বিদ্বেষমূলক) আর আমরা (বিনা দলীলে শুধু) তোমার কথায় নিজেদের (পূর্বতন) উপাস্য দেব-দেবীদের (উপাসনা) পরিত্যাগ করতে পারি না, আমরা (কখনো) তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন (উপাস্য) দেবতা তোমাকে কোন অনিষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (যেহেতু তুমি এদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছ, তাই তারা ক্রোধান্বিত হয়ে তোমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে; এ জন্যই তুমি আজেবাজে কথা বলছ যে, আল্লাহ্ এক এবং আমি তার নবী।) হযরত হুদ (আ) বললেন, (দেবতারা আমাকে উন্মাদ করেছে বলে (তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, তজ্জন্য (আমি প্রকাশ্যভাবে) আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি, আর তোমরাও (শুনে রাখ এবং) সাক্ষী থাক যে, তোমরা (আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের মধ্যে) যা কিছুকে শরীক (সাব্যস্ত) করছ (তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই), আমি তা থেকে (সম্পূর্ণ) বিমুখ। (মূর্তির সাথে আমার দুশমনী আগেও অজানা ছিল না, এবারের ঘোষণার ফলে তা আরো সুস্পষ্ট হল। অতএব, যদি এসব দেব-দেবীর কোন ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকে, তবে) আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা (ও দেবতারা) সবাই মিলে আমার (বিন্দুমাত্র) অনিষ্ট (সাধন) করার (জন্য সর্বাত্মক) প্রয়াস চালাও, অতপর আমাকে কোন অবকাশও দিও না, (এবং কোন ত্রুটিও করো না, দেখি তোমরা আমার কি করতে পার; আর তোমরা ও তারা সবাই মিলেও যখন কিছু করতে পারবে না, তাহলে তারা একাকী কি করতে পারে? আমি মুক্তকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করছি; কেননা, মূর্তিগুলো তো সম্পূর্ণ অক্ষম, জড় পদার্থ, আমি তাদের মোটেই ভয় পাই না আর তোমাদের সামান্য ক্ষমতা থাকলেও তা আমি পরোয়া করি না। কারণ,) আমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর নিশ্চিন্ত ভরসা করছি, যিনি আমার ও তোমাদের (মালিক) পরওয়ারদিগার। ধরাপৃষ্ঠে বিচরণশীল যত প্রাণী রয়েছে সবাই তাঁর কব্জার মধ্যে রয়েছে। (সবাই তাঁর অসীম কুদরতের করায়ত্ত, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ নড়াচড়া করতে পারে না। তাই আমি তোমাদের পরোয়া করি না। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে একটি নতুন মু'জিযা প্রকাশ পেল যে, এক ব্যক্তি একাকী দাঁড়িয়ে সমগ্র জাতির সম্মিলিত জনশক্তির মুকাবিলা করেছেন, কিন্তু সবাই মিলে তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারছে না। এটা তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "তুমি আমাদের সম্মুখে কোন প্রমাণ পেশ করনি, আমাদের দেব-দেবীরা তোমার উপর ভূত চাপিয়ে দিয়েছে,—ইত্যাকার উক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাবও হয়ে গেছে, নবুয়ত ও তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে।—'তোমার কথায় আমাদের দেবতা-দেরকে পরিত্যাগ করতে পারি না'—বাক্যটি বাতিল হয়ে গেছে; আর এটাই হচ্ছে

সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথ।) সরল পথে (চলার মাধ্যমেই) আমার পরওয়ারদিগারকে (পাওয়া যায়) সন্দেহ নেই। (অতএব, তোমরাও সরল পথ অবলম্বন কর। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করে ধন্য হবে। এত জোরালো বক্তব্যের পরেও) যদি তোমরা (সত্য পথ হতে অন্য দিকে) মুখ ফিরাও তবে (সেজন্য আমি দায়ী নই। কেননা,) আমার কাছে তোমাদের প্রতি (পৌঁছাবার জন্য) যে পয়গাম প্রেরিত হয়েছিল আমি তা (যথাযথভাবে) পৌঁছে দিয়েছি। (অতএব, আমি দায়মুক্ত। কিন্তু তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন) এবং আমার পালনকর্তা অন্য লোকদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। (অস্বীকার ও অমান্য করে তোমরা নিজেদেরই সর্বনাশ করছ) এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না (ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে যদি কারো সন্দেহ হয় যে, কে কি করছে, আল্লাহ্ তা কি জানেন? তাহলে জেনে রাখ) নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই প্রতিটি বস্তুর হিফাযতকারী, (তিনি সব খবর রাখেন। এতদসত্ত্বেও তারা ঈমানের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল) এবং (আযাবের ফয়সালা ও প্রস্তুতি শুরু হল।) যখন (আযাবের জন্য) আমার নির্দেশ নেমে এল (এবং প্রচণ্ড ঝড়-তুফানরূপে আযাব নাযিল হলো, তখন) আমি নিজ রহমতে (হযরত) হুদ (আ)-কেও তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে (উক্ত আযাব হতে) রক্ষা করেছি। আর (আমি) তাদেরকে (এক) কঠিন আযাব হতে রক্ষা করেছি (সামনে অন্যদের শিক্ষার জন্য বলা হচ্ছে)-এ ছিল আদ জাতির (কাহিনী), যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে (অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ ও হুকুম-আহকামকে) অস্বীকার করেছে এবং তদীয় রসূল (আ)-গণের কথা অমান্য করেছে। আর এমন লোকের কথামত কাজ করেছে, যারা ছিল অহংকারী, হঠকারী। (যার ফলে) এ দুনিয়াতে (আল্লাহ্র) অভিসম্পাত তাদের পিছনে পিছনে রয়েছে এবং কিয়ামতের দিনেও (তাদের সাথে সাথে অভিশাপ থাকবে। যার ফলে ঝড়-তুফানের কবলে পড়ে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী কঠিন আযাব ভোগ করবে)। মনে রেখ, 'আদ জাতি স্বীয় পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, আরো জেনে রাখ, (কুফরীর পরিণতিতে দুনিয়া ও আখিরাতে) হযরত হুদ (আ)-এর জাতি 'আদ জাতি (আল্লাহ্র) রহমত হতে দূরীভূত ও অভিশপ্ত হয়েছে।

আর আমি সামূদ জাতির প্রতি তাদের (গোত্রীয় বা দেশীয়) ভাই (হযরত) সালেহ (আ)-কে (পয়গম্বররূপে) প্রেরণ করি। তিনি (স্বীয় জাতিকে আহবান করে) বললেন—হে আমার কওম, (তোমরা একমাত্র) আল্লাহ্র বন্দেগী কর, তিনি ভিন্ন (অন্য) কেউ তোমাদের মাবুদ (হওয়ার যোগ্য) নেই। (তোমাদের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান এই যে,) তিনিই তোমাদেরকে যমীনের (সারাংশ হতে) সৃজন করেছেন, (এবং তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি যেহেতু পরম দয়ালু ও করুণাময়) অতএব, (নিজেদের কুফরী শিরকী ইত্যাদি গোনাহ হতে) তাঁর কাছে মার্জনা চাও, (ঈমান আনয়ন কর) অতপর (ইবাদত ও সৎকার্যের মাধ্যমে) তাঁরই দিকে ফিরে চল। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদিগার (ঐ ব্যক্তির)

নিকটেই রয়েছেন (যে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করে, আর কেউ তাঁর কাছে পাপ ক্ষমা করার আবেদন জানালে তিনি তা) কবুল করে থাকেন। (তদুত্তরে) তারা বলতে লাগল, হে সালেহ (আ)! এতদিন (যাবত) তুমি আমাদের আশাস্থল ছিলে, (তোমার যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব আমাদের জাতির জন্য গৌরবজনক ছিল, তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমরা আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু তোমার কথাবার্তায় দেখছি আমাদের আশা বিলীন হতে যাচ্ছে।) আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা (আরাধনা) করতো, তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা-অর্চনা করতে নিষেধ কর? আর যার (তওহীদের) প্রতি তুমি আমাদেরকে আহবান জানাচ্ছ, আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না (একত্ববাদের চিন্তাধারা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না)।

[তখন হযরত সালেহ (আ)] বললেন—হে আমার দেশবাসী, (তোমরা আমাকে মূর্তি পূজার বিরোধিতা করতে ও একত্ববাদের দাওয়াত দিতে নিষেধ করছ) আচ্ছা বল তো; আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে জ্ঞান (গরিমা) লাভ করে থাকি, এবং তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) দান করেন, (যার ফলে তওহীদের প্রচার ও প্রসারের জন্য আমি আদিষ্ট হই;) অতপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই (অর্থাৎ তোমাদের কথামত তওহীদের দাওয়াত পরিত্যাগ করি), তাহলে (বল তো,) তাঁর (আযাব) হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? তোমরা তো (কুমন্ত্রণা দিয়ে) আমার (শুধু) ক্ষতিই করতে চাও। (নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তারা যেহেতু মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল, তাই তিনি বললেন) আর হে আমার কওম, (তোমরা মু'জিযা দেখতে চাও, তাহলে) আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন (স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হওয়ার কারণে একে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী বলা হয়েছে। মু'জিযা হিসাবে এটা আমার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ। অতএব, এর নিজস্ব কতিপয় অধিকার রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যে,) তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে বিচরণ করে (ইচ্ছামত ঘাস) খেতে (সুযোগ) দাও। (অনুরূপভাবে তার পালার দিন পানি পান করার কথা অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) আর (অনিষ্ট করা বা কষ্ট দেওয়ার জন্য) মন্দভাবে এটাকে (কখনো) স্পর্শও করবে না। নতুবা (অতি) সত্বর তোমাদেরকে আযাব এসে পাকড়াও করবে।

(তাদের এত করে বোঝানো হল,) তবুও তারা একে (পা কেটে) হত্যা করল, তখন (হযরত) সালেহ [(আ) তাদের লক্ষ্য করে] বললেন—(আচ্ছা,) তোমরা নিজেদের গৃহে (মাত্র) তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। (তিনদিন পরেই আযাব আপতিত হবে। আর) এটা (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) এমন (নিশ্চিত) ওয়াদা যা (চুল পরিমাণ) মিথ্যা (প্রতিপন্ন) হতে পারে না।

অতপর (তিন দিবস অতীত হওয়ার পরে) যখন (আযাবের জন্য) আমার হুকুম (এসে) পৌঁছল, (তখন) আমি (হযরত) সালেহ (আ)-কে ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে (নিরাপদে) উদ্ধার করি এবং সেদিনকার লাঞ্ছনা হতে